কলকাতা সমুদ্র

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্তিক লাহিড়ীর প্রথম যে উপন্যাসটি আমি পড়ি, সেটি ‘দশরথ নামে একজন’। দ্বিধা ছিল, কারণ কার্তিক লাহিড়ীকে প্রাবন্ধিক হিসাবেই জানতাম, আর তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম বিষয় উপন্যাস। এই অ্যাকাডেমিক অর্থেও প্রাবন্ধিকের উপন্যাস পড়া আগে সংশয়ে দুলেছিলাম, কেমন হবে? উপন্যাসের তত্ত্ব গল্পকে আড়ষ্ট করে দেবে না তো? নিজ উপন্যাসের তত্ত্ব গল্পকে আড়ষ্ট করে দেবে না তো? নিজ উপন্যাস - বীক্ষারই একান্তর খুঁজবেননা তো ঔপন্যাসিক? পড়তে পড়তেই বুঝলাম, এ সংশয়, দ্বিধা অমূলক গল্প বলছেন ঔপন্যাসিকের বীক্ষা - ভূমি থেকে, প্রচ্ছন্নভাবে পরীক্ষা - নিরীক্ষাও যা করছেন তা ১৯৬০ -এর দশকের প্রথম দিকে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পঞ্চাশের দশকের দেবেশ রায় - দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বাংলা গল্পে বিশেষতঃ নতুন - পর্যায় আনছেন তখন ‘সাহিত্যপত্রে’ কার্তিক লাহিড়ীর ‘কলকাতা সমুদ্র’ অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। তারও প্রায় কুড়ি বছর পরে নবরূপে উপন্যাসটি প্রকাশ পেল। ইতিমধ্যে তার আটটি উপন্যাস বেরিয়েছে— কোনটাই আকারে বৃহৎ নয়। ১৯৯৩ -এর পরেও কার্তিক লাহিড়ী উপন্যাস লিখেছেন— প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছোট গল্প - সংগ্রহ। প্রাবন্ধিক এখন প্রধানত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। অথচ প্রবন্ধের বই অন্ততঃ চারটে এবং গুরুত্বপূর্ণ।

‘কলকাতা সমুদ্র’ উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা তিরাশি। কিন্তু উপন্যাসের রিদম বা ছন্দ কার্তিক লাহিড়ীর এমন আয়ত্তে যে ঐ স্বল্প আকারই উপন্যাসের বিস্তার পায়। সাতটি পরিচ্ছেদে প্রায় অঙ্কের মত ঔপন্যাসিক তাঁর গল্পকে সাজিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রথম পরিচ্ছেদে জুয়ার আড্ডায় নিরঞ্জন— অফিসের ক্যাশ ভেঙে মরিয়া সে জুয়ার জিততে চায় যদি যেতে তবে সব সমস্যার সমাধান। জেতেনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৩৩ থেকে ৪৯) বাড়ি — স্ত্রী দীপার সামনে। তৃতীয় তরঙ্গে অফিস— (পৃঃ ৪৯ - ৬৩) — বাড়িতে চাল নেই, বাড়ি ফেরা। চতুর্থ তরঙ্গে অফিস— (পৃঃ ৪৯ - ৬৩) — বাড়িতে চাল নেই, জুয়ার কপর্দকহীন, ফোর্থ গ্রেড স্টাফ শুকদেবের কাছে টাকা যাওয়া এবং চাল ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি ফেলা। চতুর্থ তরঙ্গে - আবার বাড়ি : দীপা, ভাই চন্দনের মুখোমুখি— আজ নিরঞ্জনের জন্মদিন। পাঁচ পৃষ্ঠায় পরিচ্ছেদ। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ছ পৃষ্ঠার—দ্রুততালে উপন্যাসের ছন্দ পাল্টাচ্ছে। ছুটে চলেছে চূড়ান্ত বিন্দুর দিকে। সাহেব অফিসে না আসায় তার চুরি ধরা পড়েনি। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই সে দীপার হার চুরি করেছে— ঐ জুয়ার অনিবার্য আকর্ষণে। ষষ্ঠ তরঙ্গে (পৃঃ ৭৪-৮৭) সাহেব আসে, চুরি ধরা পড়ে। এ তরঙ্গ চার - পাঁচের মত দ্রুত নয়, একটু ধীর আর শেষের সাড়ে চার পৃষ্ঠার সব কিছু ভেঙে পড়া। এক না, না-র ঐকতানের মধ্যে নিরঞ্জন। তার ‘‘সামনে বিশাল সমুদ্র - অন্ধকার, শব্দের সমুদ্র - আলোড়িত, আর সে মজ্জামান তরণীতে ভাসতে ভাসতে মাটির আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে তেষ্টায় জলের জন্য অসহায়ভাবে চারদিকে তাকতে তাকাতে লবনাক্ত জল খেতেই চীৎকার করে ওঠে— বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। এই একজন ব্যক্তির অসহায় আর্তনাদ, বাঁচবার ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টার পাশে ‘‘কলকাতার জনসমুদ্র শব্দসমুদ্র নিরঞ্জনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে সম্পূণঅ ডুবিয়ে দিয়ে আগের মতো তরঙ্গের লয় বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে; নিরঞ্জনের অস্তিত্ব অনঅস্তিত্ব সম্পর্কে নির্বিকার কলকাত তখন অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দনে দোলায়িত। ব্যক্তি ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাস্তব এ উপন্যাসে এক দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ: কলকাতার সমুদ্র — তবে সে সমুদ্রে অন্ধকার অসহায় মজ্জামানতা থাকে, থাকে ডুবতে ডুবতে বাঁচবার জন্য আকুল হাহাকার।

কার্তিক লাহিড়ী নিরঞ্জনের গল্প বলেন। একটি ছেলে মফস্বল থেকে কলকাতায় আসে; কলকাতায় বাস করতে থাকে, বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোগ করে, রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাতে ফুট পাতে ঘোরে, বন্ধ সব দরজা, এর মধ্যেই দীপা নাম্নী একটি মেয়েকে ভালবাসে, চাকরি পায়, বিয়ে হয়, একটি কন্যা হয় । তাদের একটি সুখী স্বচ্ছন্ন জীবন। কিন্তু তারপর ঐ মানুষটির জুয়ার নেশায় — হঠাৎ অর্থ পেয়ে সব ইচ্ছা চরিতার্থর নেশায় ? আমি রাজা, সব ধার শোধ, দীপার জন্য ভালো শাড়ি, একটা জমি আর...। নিরঞ্জন কেন এমন হলো? কেন আজ দীপার সঙ্গে তার অসেতুসম্ভব দূরত্ব? মেয়ে রুমিকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে দীপা, কেন? এর মূলে কি দীপার চাহিদা? নাকি এ সময়? নাকি কলকাতা? ‘‘আমি -ই তো আস্তে আস্তে কলকাতায় মিশে যেতে থাকলাম, ভুলে গেলাম আমি কে, দীপা আমার কে? নাকি বিয়ের পর দীপার জন্য উত্যক্ত হয়ে আমি নিজেকে বিসর্জন দিলাম, মুছে গেল আমার পরিচয় আমার বৈশিষ্ঠ্য আমার ব্যক্তিত্ব, আমি স্বেচ্ছায় কলকাতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলাম কিন্তু দীপা’’ দীপা কি বারণ করেনি বারবার। নাকি সে আমাকে ঠেলে দিয়েছে আনুষাঙ্গিক নানা জিনিস চেয়ে চেয়ে? তবে কি দোষ নিরঞ্জনের নিজের নয়? দীপার জন্যই...। বস্তুতঃ এ শংশয়, এই আত্মসচেতনতায় নিরঞ্জন হয়ে ওঠে আধুনিক মানুষ। দীপার সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন হিম শীতল, কিন্তু সে এখনও দীপার হাসি, দীপার মুখে একটু কোমল উচ্চারণে বর্তে যায়, ভাই চন্দনের সঙ্গে দীপার সম্পর্কের কথা ভেবেই লজ্জিত হয়ে পড়ে অমূলক সন্দেহের জন্য, এখনও তার মনে হয় ঐ কলকাতার হাত থেকে দীপাই তাকে বাঁচাতে পারে। অথচ দীপা সবই জেনে গেছে, তার ভাঁড়ারে চালবাড়ন্ত— তারপক্ষে নিরঞ্জনকে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া পথ নই।

দক্ষ ঔপন্যাসিকের মত কার্তিক লাহিড়ী জুয়া খেলার বিবরণ টুকরো টুকরো করে দেন— এক হিংস্র হননে যেন কুশীলবরা মেতেছে। আর নিজ কর্মের জন্য অপরাধবোধে তাড়িত অথচ জুয়ার চুম্বরের মত আকর্ষণে বাঁধা নিরঞ্জনকে ঔপন্যাসিক চলচ্চিত্রের পদ্ধতি তিতে কলকাতার মধ্যে নিয়ে যান ঐ জুয়ার ঘরেই। দ্রুত ঐ কুরক্ষেত্রে পৌঁছাতে গিয়ে সে রাস্তায় লরির তলাতেই পড়ে যাচ্ছিল—‘‘রাক্ষুসী কলকাতা ক্রমশ মায়াবী হয়ে উঠছে। সে মায়াবী সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকে।’’ তার কানে বাজে বাড়িতে চাল নেই। টাকার দরকার, দীপার চোখ। কলকাতা সমুদ্রের হাজার লক্ষ ঢেউ ও গর্জন তা তলিয়ে দিতে পারছেনা তবু। ‘‘দীপা। দীপা। দীপান্বিতা বিশ্বাস। নিরঞ্জন মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকে, কবে থেকে এমন ঘাতক হয়ে উঠলো? আমিই কি তাকে তিলে তিলে হত্যা করেছি?’’ জুয়ার সেই কক্ষে যাবার পথে উর্ধ্বশ্বাসে নিরঞ্জন ভেবে যায়। তার ঐ ভয়ঙ্কর নেশায় ডোবা ও তার প্রেম দীপার তার কাছে প্রায় মৃত্যু, দুইই তো কলকাতার রাক্ষসী গর্ভে জন্ম নেয়। যে প্রেমে নিরঞ্জন একদিন আকাশ রোদ দেখেছিল। সেই প্রেমই আজ সন্দেহে, অভিযোগে ভেঙে যাচ্ছে জীবনের এক টাকার বিকারে কলকাতা সেই গ্রাম - মফস্বলের ছেলেটিকে এভাবেই টাকা, অর্থের মায়াবী দানবের কাছে ফেলে দিয়েছে।

হাতে তাস ঘুরছে; ঘর স্তব্ধ। ‘‘আরো স্তব্ধতায় পৃথিবী ঘুরে চলেছে। এই ঘর পৃথিবীর উপর অবস্থিত বলে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চলেছে— আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে, বোঝার উপায় নেই তবু।’’ ভাগীরথী নদীতে স্রোত কুল কুল শব্দে আবর্ত তুলেছে, ইছামতীর গতি তিরতির,